সাতদিন

১৯ ফেব্রুয়ারি : মন্ত্রিসভা উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধনের তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে এখন সরকার উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত নেবে।

সিআইডি পুলিশ মালিবাগ বাজারের উল্টাদিকে নয়াটোলা সোনালীবাগের কুত্তামারা গলিতে অভিযান চালিয়ে পেশাদার সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের ৭ সহযোগীকে অস্ত্রশস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করেছে।

২০ ফেব্রুয়ারি : মিছিলে গুলি করে হত্যার অভিযোগে সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ইকবাল ও তার দেহরক্ষী কিরণের বিরুদ্ধে সিএমএম কোর্টে জননিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নয়জন অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে।

২১ ফেব্রুয়ারি : আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি– হৃদয় ছোঁয়া এই সুর আবেগাপ্লুত করে তুলেছিল সারা দেশবাসীকে। শহর-বন্দর-গ্রাম সর্বত্র ছিল আবেগ উচ্ছ্বাস আর আনন্দ উৎসবের অনিন্দ্য সুন্দর মুহূর্ত। যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে মহান একুশে এবং ২য় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি : বর্তমান সপ্তম জাতীয় সংসদের কোনো উপনির্বাচনে জাতীয় পার্টির কোনো অংশই লাঙ্গল প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না বলে কমিশনার এমএ সাঈদ এবং তিন নির্বাচন কমিশনার লাঙ্গল প্রতীক বরাদ্দ সংক্রান্ত এই রায় প্রদান করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি : শিল্পপতি গোলাম কিবরিয়াকে মাতাল অবস্থায় ঘুষি মেরে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ উত্তরা ১ নম্বর সেক্টরের ১০ নম্বর রোডের ১৯ ও ২০ নম্বর ভবনের মাঝামাঝি স্থানে প্রাইভেট কারের ভেতর হতে গোলাম কিবরিয়ার লাশ উদ্ধার করে।

খুলনা মহানগরীতে আওয়ামী লীগ নেতা সরদার হারুন অর রশিদ আততায়ীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি : রাঙ্গামাটির গুনিয়াপাড়া হতে অপহৃত তিন বিদেশী প্রকৌশলীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা রাঙামাটিতে তিন বিদেশী অপহরণের সঙ্গে তার রাজনৈতিক সংগঠনের কোনো প্রকার জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি : উপজাতীয় অপহরণকারীদের গহীন বনের বন্দীশালা হতে তিন ইউরোপীয়কে মুক্ত করার প্রক্রিয়া জোরদার করার জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দুই পুলিশ কর্মকর্তা এবং ব্রিটিশ হাই কমিশনের ডিফেন্স অ্যাটাসে।

রাজধানীতে কিছু রিকশা ও বেবিট্যাক্সি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, বোমায় তিন শিশু আহত, জিঞ্জিরায় মিছিলে হামলা ও অগ্নিসংযোগসহ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সারাদেশে বিএনপিসহ চারদল আহূত দু'দিনের হরতালের প্রথম দিন ছিল শান্তিপূর্ণ।

মৌলবাদী তান্ডব
কর্মহীন ফেব্রুয়ারি

মৌলবাদী এই তান্ডব, নাশকতা প্রভৃতি ঘটনায় যখন দেশবাসী উদ্বিগ্ন তখন চারদলের তরফ থেকে তেরোই ফেব্রুয়ারি আবার হরতাল আহ্বান করা হয়... লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

মাস হিসাবে ফেব্রুয়ারি আটাশ দিনের। চার বছরের মাথায় একদিন বাড়ে। সেই আটাশ দিনের আঠারো-উনিশ দিন যখন ছুটি-হরতালে চলে যায় তখন সে মাসে কোনো কাজ হয় না। এবারের ফেব্রুয়ারি ছিল সেরকমই একটি মাস।

ফেব্রুয়ারি সাধারণত আগুন ঝরার মাস। ভাষা শহীদদের স্মৃতিজাগানিয়া মাস হিসাবে ফেব্রুয়ারি মাস কমবেশি টালমাটাল থাকে সবসময়। বায়ান্ন'র একুশে ফেব্রুয়ারির পর থেকেই ফেব্রুয়ারি মাস এলেই এ দেশের ছাত্র-জনতা চঞ্চল হয়ে উঠত। ষাটের দশকের শুরুতে এই ফেব্রুয়ারিতেই ছাত্ররা আবার আইয়ুবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা করেছিল। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানও পরিণত লাভ করেছিল এই ফেব্রুয়ারি মাসেই। এরশাদ বিরোধী গণসংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তিরাশির মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে।

সেই ফেব্রুয়ারি এবার পরিণত হয়েছে মোল্লাতন্ত্র আর দুঃশাসনের তান্ডব, অনাবশ্যক হরতাল ও হত্যা-কর্মহীন-উদ্দেশ্যহীন মাসে।

এবার ফেব্রুয়ারির যাত্রা শুরু হয়েছিল ভালোভাবেই। সারা দেশে যে সন্ত্রাস, দুর্নীতি লুটপাট, সাম্প্রদায়িক শক্তির চক্রান্ত ও অপরাজনীতির দাপট চলছে তার বিরুদ্ধে এগারোদলের বাম প্রগতিশীলদের জোট মাসব্যাপী তাদের প্রচারের সমাপ্তি কর্মসূচিতে পহেলা ফেব্রুয়ারি সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছিল। ক্ষমতার রাজনীতির 'ডরতালের' বিপরীতে জনগণের আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে 'হরতাল' অস্ত্রকে সুস্থ রাজনীতি ও জনগণের দাবি আদায়ের জন্য ব্যবহার সারা দেশের জন-গণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেয়েছিল। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম ছিল পহেলা ফেব্রুয়ারির এগারোদলের হরতালের মিছিলে আওয়ামী প্রতিমন্ত্রী মায়ার হামলার ঘটনা।

তেরোই ফেব্রুয়ারির হরতাল শুরু হয়েছিল খুবই ঢিলেঢালা ও শিথিলভাবে। কিন্তু সকাল না পেরোতেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শত্রু হননে। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ডা: ইকবালের নেতৃত্বাধীন মিছিল থেকে বিএনপি'র মিছিলে গুলি হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয় তিনজনকে। রাস্তার পাশে ব্যারাকে নিশ্চিন্তে দাঁড়ানো পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের গুলিতে। এরই ফলশ্রুতি ছিল চৌদ্দ ও পনেরো তারিখের হরতাল। সাধারণভাবে ঐ হরতাল কোনো রাজনৈতিক প্রভাব না ফেললেও দেশের অর্থনৈতিক জীবন অচল থাকে ঐ হরতালের ঘটনায়।

ঢাকায় হরতাল হয়েছে জাতীয় রাজনীতির কারণে। কিন্তু দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামও পিছিয়ে ছিল না। চট্টগ্রামে বিএনপি নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে চারদল এগারোই ফেব্রুয়ারি হরতাল ডেকেছিল। এর আগেও চট্টগ্রামে ইসলামী দলগুলোর নামে হরতাল হয়েছে। তেরো-চৌদ্দ পনেরোই ফেব্রুয়ারির দেশব্যাপী হরতালকে যুক্ত করলে ফেব্রুয়ারি মাসেই চট্টগ্রামে হরতাল হয়েছে চারদিন।

সব মিলিয়ে ঢাকায় দেশব্যাপী হরতাল হয়েছে সাতদিন, চট্টগ্রামে চারদিন, ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ায় দুইদিন। এসব হরতালের তান্ডবে নিহত হয়েছে

সর্বমোট সতেরো জন।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের পঁচিশ-ছাব্বিশ দু' দিন হরতাল। সামনে ঈদুল আযহা। গরুর হাট বসবে সারা দেশে। পরিবহনের জন্য চাই উন্মুক্ত সড়ক। হজের জন্য ফ্লাইট ধরতে আসছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হজ যাত্রীরা। এই হরতাল কেউ মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু চারদলের উগ্রপন্থিরা হরতাল করবেই। বেগম জিয়ার সিঙ্গাপুর যাওয়ার প্রাক্কালে বিমান বন্দরে তাকে হরতাল একদিন কমাতে বলা হয়। জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী রাজি না। এ নিয়ে তিন-দিন বৈঠক হয়েছে চারদলের লিঁয়াজো কমিটির। কিন্তু চারদলের আন্দোলনের ইনিশিয়েটিভ চলে গেছে ইসলামপন্থিদের হাতে। বিএনপি চেষ্টা করেও হরতাল একদিন কমাতে পারেনি।

আটাশ দিনের ফেব্রুয়ারির এই মাসে সাপ্তাহিক আট দিন ছুটির সাথে যুক্ত হয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারির জাতীয় ছুটি। নয় দিন সরকারিভাবেই বন্ধ ছিল সারা দেশ। আর নয়দিন বেসরকারি-ভাবে। চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হরতালের আরও দু'দিন যুক্ত করলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য সেটা দাঁড়ায় এগারোদিন। কারণ চট্টগ্রাম বন্ধ থাকলে আমদানি-রপ্তানি হতে পারে না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হরতাল কেবল ব্রাহ্মণবাড়িয়াকেই অচল করে দেয়নি, ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথকে অচল করে দিয়েছিল। রেলের ফিশ প্লেট তুলে কোথায় যেন আরও একদিনের জন্য ঐ রেলপথ বন্ধ ছিল। সব মিলিয়ে আটাশ দিনের ফেব্রুয়ারি আট দিনে পর্যবসিত হয়েছিল।

আটাশ দিনের কর্মদিবস যখন আট দিনে পরিণত হয় তখন যে সব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডই থেমে যায় এটা সবার জানা কথা। মৌলবাদী ও দুঃশাসনের তান্ডবের জন্য ফেব্রুয়ারি মাসটা সবাইকে উদ্বিগ্ন রেখেছে, তেমনি হরতালের কারণে রেখেছে কর্মহীন। একজন টেক্সটাইল রপ্তানি-কারকের হিসাব অনুযায়ী সে যদি মাসে ১ লাখ ২০ হাজার ডলারের রপ্তানি করতে পারে তবে তার ব্রেক-ইভেন হয়। সে তার শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংকের ঋণ ও সুদ, ইলেকট্রিক বিলসহ অন্যান্য সব বিল শোধ করতে পারে। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে তার রপ্তানি হয়েছে মাত্র ৭০ হাজার ডলার। পঁচিশ-ছাব্বিশ দু'দিন তার রপ্তানি ছিল। হরতালের কারণে সেটা সম্ভব হবে না। এমনকি একদিন হরতাল তুলে নিলেও না। এরপর ঈদুল আযহা। শ্রমিক কর্মচারীদের যেমন ঈদের আগে তার বেতন পরিশোধ করা সম্ভব হবে না, তেমনি ঈদের ছুটি কাটিয়ে রপ্তানি পুনঃচালু করতে আরও পনেরোদিন চলে যাবে। ফলে তার টেক্সটাইলের জন্য যে অর্ডার ছিল তা বাতিল হয়ে যাবে।

কর্মহীন ফেব্রুয়ারিতে কারও ঘরেই টাকা নাই। ফেব্রুয়ারির অর্থনীতি মাইনাস পর্যায়ে।

'হরতাল' শব্দটি বাংলা নয়, গুজরাটি। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশদের সাথে অসহযোগ করতে এই 'হরতাল' অস্ত্রের প্রয়োগ করতেন। কিন্তু সেই অসহযোগ সহিংস হয়ে গেলেই তা প্রত্যাহার করে নেয়ার উদাহরণও তিনি করে গিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশে এই হরতালের অসহযোগিতা নিজের দেশের বিরুদ্ধে, নিজের মানুষের বিরুদ্ধে– কেবল ক্ষমতার জন্য।

পাহাড়ে জিম্মি এবং সন্তু লারমার উত্তরাঞ্চল সফর

বিদেশী জিম্মি উদ্ধার করে 'হিরো' হতে চেয়েছিলেন কল্পরঞ্জন চাকমা। তার এই প্রক্রিয়ায় বাদ সেধেছে সেনাবাহিনী। যতই সময় যাচ্ছে ততই কল্পরঞ্জন চাকমার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে উঠছে। নিজে তো বিপদে জড়িয়ে পড়েছেনই, বিপদে ফেলছেন আওয়ামী লীগকেও... লিখেছেন **গোলাম মোর্তোজা**

গ্রামীণ প্রবাদ, 'কাউকে দাবড়াতে হলে, নিজেকে দৌড়াতে হয়'। আওয়ামী সরকার দাবড়াতে চেয়েছিল জনসংহতি সমিতিকে। সন্তু লারমাকে। কতটুকু দাবড়াতে পেরেছে, সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ। তবে পেছনে দৌড়াতে গিয়ে সরকার হয়রাণ। দৌড়ানো প্রায় থেমে গেছে, হাঁটছে। একেবারে দাঁড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন বিদেশী জিম্মি উদ্ধারে সরকার এখনো পর্যন্ত (২৬ ফেব্রুয়ারি) কোনো সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা অপহরণ ঘটনাকে নাটকের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। বিতর্কিত করে তুলেছেন। চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ-ই যে তিন বিদেশীকে অপহরণ করেছে, শুরু থেকেই এটা স্পষ্ট ছিল। কিন্তু কল্পরঞ্জন বলেন, 'অপহরণ চুক্তির পক্ষ-বিপক্ষ দুই গ্রুপের যে কেউই করতে পারে। একটি সূত্র জানায়, উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয়া থেকে জনসংহতি সমিতিকে দূরে ঠেলে দেয়ার জন্যই কল্পরঞ্জন এ কথা বলেন।

সরকারের পক্ষ থেকে জিম্মি উদ্ধার কার্যক্রমে যাবতীয় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কল্পরঞ্জন চাকমাকে। তার সঙ্গে রয়েছেন আরেক সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার। এই দুইজনের মধ্যেও রয়েছে বিরোধ। শুরুতে অপহরণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল রণজিৎ চাকমাকে। কিন্তু কল্পরঞ্জন তাকে বাদ দিয়ে মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব দেয় আর্কিমিডিস চাকমাকে। আর্কিমিডিস চাকমাকে বলা হয় কল্পরঞ্জনের নিজের লোক। আর্কিমিডিস সরাসরি চুক্তি বিরোধী প্রসিত-সঞ্চয়দের ইউপিডিএফ-এর সঙ্গে জড়িত। জানা যায়, অপহরণের পুরো প্রক্রিয়াটি আর্কিমিডিস আগে থেকেই জানতো। মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে এসে আর্কিমিডিস কল্পরঞ্জনকে বোঝায় যে, সেনা কর্ডন তুলে নিতে হবে। অপহরণকারী এবং মধ্যস্থতাকারী উভয়েই একই ভাষায় কথা বলতে থাকে। কারণ উভয়েই একই গ্রুপের সদস্য। বেশ সহজে যে সমস্যাটি সমাধান হতে পারতো কল্পরঞ্জন চাকমা এবং আর্কিমিডিস চাকমা সেটাকে জটিল করে তোলেন।

কল্পরঞ্জন সেনা কর্ডন তুলে নেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। এর তীব্র বিরোধিতা করে

তিন বিদেশী অপহরণের পর থেকেই সন্তু লারমাকে পরিকল্পিত-ভাবে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়

সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর দাবি, কর্ডন করে রাখা এলাকার মধ্যেই অপহরণকারীরা আছে। ঘেরাও তুলে নেয়া হলে, অপহরণকারীরা আরো দুর্গম এলাকায় চলে যাবে। তখন অপহরণকারীরা যা চাইবে সেটা দিয়েই জিম্মি উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু কল্পরঞ্জন চাকমা এটা মানতে রাজি নন। তিনি সেনা কর্ডন তুলে নিতে চান এবং মুক্তিপণ হিসেবে নয় কোটি টাকাও অপহরণকারীদের হাতে তুলে দিতে চান।

প্রশ্ন হলো কল্পরঞ্জনের এই ভূমিকার কারণ কী? কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই পাহাড়িদের থেকে দূরে সরে এসেছেন। তিনি এখন পাহাড়িদের ভাষায় কথা বলেন না, কথা বলেন আওয়ামী লীগের ভাষায়। গত সাড়ে চার বছরে তিনি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। গত নির্বাচনে তিনি যখন বিজয়ী হয়েছিলেন, তখন জনসংহতি সমিতি তাকে সমর্থন করেছিল। ফলে তার জন্য জেতা সহজ হয়েছিল। এখন জনসংহতি প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল। এবার জনসংহতি সমিতি কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার বা বীর বাহাদুরকে সমর্থন করবে না। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির সমর্থন ছাড়া এদের পক্ষে জিতে থাকা শুধু কঠিনই নয়, প্রায় অসম্ভব।

এই অবস্থায় বিদেশী জিম্মি উদ্ধার করে 'হিরো' হতে চেয়েছিলেন কল্পরঞ্জন চাকমা। তার এই প্রক্রিয়ায় বাদ সেধেছে সেনাবাহিনী। যতই সময় যাচ্ছে ততই কল্পরঞ্জন চাকমার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে উঠছে। নিজে তো বিপদে জড়িয়ে পড়েছেনই, বিপদে ফেলছেন আওয়ামী লীগকেও। কল্পরঞ্জন চাকমার সঙ্গে যে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফএর যোগাযোগ আছে, এখন সেটা প্রমাণিত হতে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন চলছে জিম্মি নাটক, তখন পাহাড়িদের নেতা সন্তু লারমা উত্তরাঞ্চলে সফরে এসেছিলেন।

নওগাঁয় নিহত আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেনের স্মৃতিস্তম্ভে ফলক উন্মোচন করেন এবং আদিবাসী কৃষকদের একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এই সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গবেষক মেজবাহ কামাল প্রমুখ। প্রশ্ন উঠেছে পাহাড়ে এমন সংকট রেখে সন্তু লারমা কেন উত্তরাঞ্চল সফরে এলেন?

অপহরণ এবং উদ্ধার বিষয়ে সন্তু লারমাকে রাজশাহী এবং নওগাঁয় বারবার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অনীহা প্রকাশ করেছেন। সন্তু লারমা পাহাড়িদের পক্ষে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। তিনি পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান। পাহাড়িদের ভালোমন্দ দেখা তার দায়িত্ব। কিন্তু তিনি এমন নীরবতা পালন করছেন কেন?

জনবিচ্ছিন্ন কল্পরঞ্জন চাকমারা যে সরকারের জন্য কোনো সাফল্য বয়ে আনতে পারবে না, সেটা ক্রমেই প্রমাণ হচ্ছে

জানা যায়, তিন বিদেশী অপহরণের পর থেকেই সন্তু লারমাকে পরিকল্পিতভাবে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অপহরণ হয় ১৬ জানুয়ারি বিকেলে। আর প্রশাসন থেকে সন্তু লারমাকে অপহরণের ঘটনা জানানো হয় পরের দিন সকালে। এ বিষয়ে রাঙ্গামাটির ডিসি-এসপি'র বক্তব্য, 'রাতে আমরা সন্তু লারমাকে বিরক্ত করতে চাইনি।'

সন্তু লারমা মনে করেন, সরকার এবং সেনাবাহিনীর শেল্টার নিয়েই অপহরণকারীরা বেড়ে উঠেছে। এই অপহরণের জন্য তারাই দায়ী।

জনসংহতি সমিতির একটি সূত্র থেকে জানা যায়, যারা অপহরণ করেছে, তাদেরই একটা অংশ এখন জিম্মি উদ্ধার করে ক্রেডিট নিতে চাইছে। সন্তু লারমাকে বিতর্কিত করে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য। তবে কারা অপহরণের সঙ্গে জড়িত এবং কারা উদ্ধার করতে চাইছে পাহাড়িদের কাছে এখন সেটা পরিষ্কার।

সন্তু লারমা বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবেই তিনি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। বাংলাদেশের একজন নাগরিক দেশের যে কোনো স্থানেই যেতে পারেন। নির্যাতিত আদিবাসীরা সন্তু লারমাকেই তাদের একমাত্র নেতা হিসেবে মনে করেন। তাই যে অঞ্চলে আদিবাসী আছে, সেই অঞ্চলে সন্তু লারমা যেতেই পারেন। এর মধ্যে অন্য কোনো গন্ধ খোঁজার কোনো কারণ নেই। বরং এটাকে বাংলাদেশের জন্য পজিটিভ হিসেবেই ধরা যায়। এই ধারা অব্যাহত থাকলে পাহাড়িদের মানসিকতার পরিবর্তন হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামই যে তাদের একমাত্র অঞ্চল নয়, সমগ্র বাংলাদেশের উপরই যে তাদের অধিকার আছে, সেই মানসিকতা গড়ে উঠবে।

আর জিম্মি উদ্ধার অভিযানে সরকার কৌশলের আশ্রয় না নিয়ে জনসংহতি সমিতির সহযোগিতা নিলে সমস্যার আরো অনেক আগেই সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। জনসংহতি সমিতির মাধ্যমে 'হেডম্যান' 'কারবারী'দের সাহায্য নিলে জিম্মি সংকট চরম আকার ধারণ করতো না। সরকার সন্তু লারমাকে বিপদে ফেলতে গিয়ে নিজেই বিপদে পড়ে গেছে। জনবিচ্ছিন্ন কল্পরঞ্জন চাকমারা যে সরকারের জন্য কোনো সাফল্য বয়ে আনতে পারবে না, সেটা ক্রমেই প্রমাণ হচ্ছে।

বাস্তবতা বলে জনসংহতি সমিতিকে বাদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন। এ ছাড়া জিম্মি অপহরণ বা নাটক যা কিছুই করা হোক না কেন, কোনো সুফল আসবে না।

দে • য়া • ল • লি • পি

...মাসতুত ভাই

আওয়ামী লীগ নেতা আখতারুজ্জামান বাবু ও ঢাকার সংসদ সদস্য হাজী মকবুল ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে পরস্পরের আত্মীয় হয়েছেন। অতীতে রাজন্যরা তাদের রাজ্যরক্ষা ও প্রভাববলয় বৃদ্ধির জন্য এভাবে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করত। এখনও রাজনীতিকরা এভাবে আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হন। তবে আখতারুজ্জামান বাবু ও হাজী মকবুলের এই নতুন সম্পর্ক সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। হুমায়ুন জহির হত্যা মামলার আসামি হওয়ার কারণে আখতারুজ্জামান বাবু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয়ভাবেই কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন। ইউসিবিএল পুনর্দখল করতে গিয়ে বাবু আরও বিতর্কিত হয়ে পড়েন এবং বিশেষ কিছু করতেও ব্যর্থ হন। হাজী মকবুলের সাথে আত্মীয়তা হওয়ার ফলে ঢাকায় বাবুর জোর বাড়বে। হাজী মকবুল বাবুর ব্যাংক দখল-ব্যবসা দখলের মত মোহাম্মদপুর এলাকায় জমি দখল-বাড়ি দখলের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। এখন দু'জনে মিলে আরও অনেক কিছু দখল করতে পারবেন।

সরকারের রাষ্ট্রপতি

আওয়ামী পন্থিদের কাছে 'বঙ্গবন্ধু' স্তুতি এমন এক বিষয় যে তাতে ইতিহাস-ভূগোল-রাজনীতি-সংবিধান কোনো জ্ঞান থাকে না। এবারের শহীদ দিবসে সে ধরনেরই একটি ঘটনা ঘটেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে শহীদ মিনারে ধারাবিবরণীতে শহীদ মিনারের পুনঃনির্মাণের ইতিহাস বলতে গিয়ে ধারাভাষ্যকার বলেন যে, 'বঙ্গবন্ধু সরকারের রাষ্ট্রপতি' আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি পাকিস্তানিদের হাতে বিধ্বস্ত শহীদ মিনারের পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু যেহেতু 'বঙ্গবন্ধু'র কথা আনতে হবে তাই ঐ রাষ্ট্রপতিকেও তিনি 'বঙ্গবন্ধু সরকারের রাষ্ট্রপতি' বানিয়ে ফেলেন। সংবিধান অবশ্য বলছে ভিন্ন কথা। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি কেবল রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিই নন, তিনি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন এবং তাকে শপথ পড়ান। তাছাড়া সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তার দায়িত্ব পালন করলেও রাষ্ট্রের সব কাজ রাষ্ট্রপতির নামেই সম্পাদন হয়। কিন্তু 'বঙ্গবন্ধু'র স্তুতি করতে গিয়ে ঐ আওয়ামী শিক্ষক দেশের রাষ্ট্রপতিকে সরকারের রাষ্ট্রপতিই বানিয়ে ফেললেন।

সিপিবি সভাপতির পদত্যাগ নাটক

সম্প্রতি হঠাৎ করেই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, সিপিবি সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান তার সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সিপিবি'র ঘনিষ্ঠ 'দৈনিক সংবাদ' ঐ খবর প্রচারও করে। ইটিভিতেও ঐ খবর প্রচারিত হয়। তবে সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম তীব্র ভাষায় ঐ সংবাদের প্রতিবাদ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে 'সংবাদ' ও 'আজকের কাগজ'-এর প্রতিনিধিদের তিরস্কার করেন। কিন্তু 'মানবজমিনে' প্রকাশিত সিপিবি সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার এ নিয়ে আলোচনা আরও বাড়িয়ে দেয়। 'মানবজমিন'-এ মঞ্জুরুল আহসান খান বলেন যে, পল্টনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ও এগারো দলের হরতালের মিছিলে সিপিবি নেতা মোজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতিমন্ত্রী মায়ার অপমান করার ঘটনার পরপরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সিপিবি নেতৃত্বের যেচে সাক্ষাৎ করা দলের মধ্যে যে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি পার্টির সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাকে সভাপতি রাখবে কিনা সেটা দল বিবেচনা করবে। এই পদত্যাগের ঘটনার সাথে যুক্ত হয়েছে মঞ্জুরুল আহসান খানের হৃদরোগের অবনতি হওয়ার ঘটনা। এগারো দলের ঝটিকা সফরে তিনি জোর করেই সিলেট গেলে সেখানে তার হৃদরোগের অবনতি হয় ও তাকে সিলেট ওসমানী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবশ্য পরদিনই তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। এই ঘটনায় সিপিবি সভাপতির ঐ পদত্যাগ নাটক খুব একটা জমে উঠতে পারেনি। তবে সিপিবি কর্মীরা মঞ্জুরুল আহসান খানের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের ঘটনাকে দলের অভ্যন্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সামাল দেয়ার কৌশল বলেই মনে করছে।